খোন্দকার আশরাফ হোসেন : এক অনুসন্ধিৎসু কাব্য গবেষক

এলহাম হোসেন

"রবীন্দ্রনাথই সর্বাংশে শেষ ভারতীয় কবি"। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশককে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম দশক কারণ এই দশকেই আধুনিক বাংলা কবিতার 'প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষ'দের কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা যায়। দু'টি প্রধানতম ঘটনা ত্রিশের দশকের কবিতার গতি-প্রকৃতিতে আমুল তোলপাড় নিয়ে আসে। এই দুই ঘটনার একটি হলো ১৯৩০ সালে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধের প্রকাশ, অপরটি হলো ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, দেখেছেন ও জেনেছেন অনেক। কিন্তু তাঁর কবিতার পটভূমি বাংলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন কবিতায় যেমন, 'বসুন্ধরা' বা 'অহল্যার প্রতি'তে বিশ্বচেতনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন বটে কিন্তু তা বাংলার পটভূমির বাইরে নয়। কিন্তু বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমীয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস যেভাবে নিজেদের আন্তর্জাতিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করে বিশ্বসংকট ও বিশ্বসংগ্রামের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন তা সত্যিকার অর্থেই তাঁদের আধুনিক বাংলা কবিতার পিতৃপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ত্রিশের যুগের এইসব কবিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যা তাঁদের কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর আমুল পরিবর্তন আনে তা হলো ইতিহাস-চেতনা। বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমীয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ প্রমূখ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কাল সচেতনতা ছাড়া কবির গত্যন্তর নাই। তাঁরা স্ব-কালকে উপলব্ধি করলেন মহাকালের প্রেক্ষাপটে।কাজেই কালের প্রবাহে বয়ে চলা ঘটনাগুলো তাঁদের সংবেদনশীল মনে আঁচড় কাটে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯১৪ সালে শুরু হয়ে ১৯১৯ পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও এর বিভিষিকা কবি মানসে এক গভীর ক্ষত তৈরি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানবতার যে বড় ক্ষতি সাধন করে তা হলো এটি মানুষকে একা করে দেয়, স্বার্থপর করে দেয়। সভ্যতার মর্মবানী যেমন- একতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ এবং আরও অন্যান্য মানবিক গুণাবলীসমূহ একটা বড় রকমের ধাক্কা খায়। উনিশ শতকের ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের অর্জন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

বিভিষিকায় ম্লান হয়ে যায়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সফলতা মার্কসবাদী ধারনায় অনেককে উজ্জীবীত করলেও ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্বজুড়ে হতাশা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তহীনতার কালো মেঘ ছড়িয়ে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বকে উপহার দেয় অসংখ্য মৃত্যু, বেকারত্ব আর স্বপ্নভঙ্গের প্রচন্ড যাতনা। রবীন্দ্রনাথের 'বীরভূমের সন্ন্যাসী মৃত্তিকা' রূপান্তরিত হলো এলিয়টের 'প'ড়ো ভূমিতে'। গ্রাম হলো লন্ডভন্ড। পুঁজিবাদীরা নিয়ন্ত্রণে নিলো উৎপাদন কাঠামোকে। কৃষক হলো কারখানার শ্রমিক। মানুষ আর পুঁজিবাদীদের চোখে মানবিক রইল না, হয়ে গেল শ্রম তৈরির কারখানা। পৃথিবীর ভৌগলিক রূপ 'কমলা লেবুর মত' বলা হলেও শ্রমিকরা হয়ে গেল কমলালেবু পুঁজিবাদীদের কাছে। ভেতরটা খায়, তারপর বাইরের খোসাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আস্তাকুঁড়ে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারন করল শ্রেণি। রিলেশন (সম্পর্ক) পরিণত হলো ডমিনেশন (প্রভূত্ব) আর সাবমিশন (আনুগত্য) তে। ব্যক্তি হলো রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীন, সে তার স্বাতন্ত্র্য থেকে হলো বিচ্ছিন্ন। রেনেসাঁর উত্তরাধিকার ভেঙ্গে পড়ল। ভাষা ও কথার মধ্যে তৈরি হলো বিস্তর ফাঁরাক। আবেগ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলো বেগের কাছে। এই বেগ সব মানবিক গুণাবলীকে নিক্ষেপ করলে রিয়ালিজম বা বাস্তবতার যাঁতাকলে যা পরতে পরতে পিষ্ঠ হতে থাকল নীতি-জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশুদ্ধতা আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র।

এছাড়া ত্রিশ এর দশকে ভেঙ্গে পড়ল মধ্যবিত্তের সভ্যতা। সমাজ ও সামাজিকতার অন্তসারশুন্যতা হয়ে উঠল প্রকট। ইংরেজি শিক্ষা বাংলা তথা উপমহাদেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করল দেশীয় ঐতিহ্য থেকে। ফলে, ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেদের ভাবতে লাগলো নিজ গৃহে পরবাসী হিসেবে। বুর্জোয়া বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় এসে ঠেকল এক আত্মবিচ্ছেদের উপলব্ধিতে। যে ঔপনিবেশিকতার চর্চা গ্রামকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সেই গ্রাম চলে গেল আগ্রহের বাইরে। আর প্রাণহীন, নির্মম পাথুরে শহর হয়ে উঠল ক্ষমতা, সভ্যতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক। সমষ্টি ভেঙ্গে গেল, পরিণত হলো ব্যক্তিতে। আর ব্যক্তি তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার খুঁজতে বের হয়ে পরিণত হলো বৈরাগীতে। এক শেকড়হীনতার তীব্র বোধ ব্যক্তিকে করে তোলে নৈরাশ্যবাদী।

ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও আপন সত্ত্বার নিষ্ফল অন্বেষণ ত্রিশের দশকের প্রজন্মকে করে তোলে চিত্ত বৈকল্যে ভোগা টি.এস. এলিয়টের মধ্যবয়সী প্রুফ্রক যে চারপাশের নানান পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের তোলপাড়ে মন:বৈকল্যে ভুগছে।

এই যে তোলপাড় চারপাশে-সমাজে, রাজনীতিতে, বিশ্বাসে, মনস্তত্ত্বে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে-তা থেকে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমীয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, সমর সেন প্রমুখ নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি। তারা নিজেদেরকে স্থাপন করেছেন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে এবং বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের যেখানেই যাই ঘটুক না কেন, যাই আবিস্কৃত হোক না কেন তাতে এঁদের আছে উত্তরাধিকার। এই উপলব্ধি থেকেই তাঁদের হাত দিয়ে বাংলা কবিতার আধুনকতার দিকে পথচলা।

কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর পি.এইচ.ডি'র অভিসন্দর্ভে বাংলা কবিতার আধুনিকায়নে পশ্চিমা প্রভাবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনাসমূহ উপস্থাপন করেছেন, তা বর্তমানে বাংলাদেশী ও বাংলা কবিতার পঠন-পাঠনের অনেকগুলো দ্বার উন্মোচন করেছে। কাঠামোবাদী পর্যালোচনা থেকে শুরু করে নিউ-হিষ্টোরিসিস্ট অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার আঁতুরঘর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে উপস্থাপনা তৈরি করেছেন, তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একটি বিবর্তনেরই ইতিহাস। কবিতা যে আকস্মিক আবেগের অবৈজ্ঞানিক প্রকাশ নয়, তা তিনি নির্ণয় করেছেন একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করে। কবিতার সোনালী শস্য একদিনে ফলেনি। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে ভূমি কর্ষণের, আর তাতে উর্বরতা দান করেছে পশ্চিমা আধুনিক কবি যেমন, বদলেয়ার, ইলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রমূখ। রবীন্দ্র বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কাব্য যেসব মহান কবির পরিশ্রমী ও বুদ্ধিদীপ্ত চর্চার মধ্য দিয়ে আধুনিকায়িত হয়েছে তাদের অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী। খোন্দকার আশরাফ হোসেন এঁদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্য কি করে আধুনিকতার উত্তরাধীকার গ্রহণ করেছিল তাঁর বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর অভিসন্দর্ভ *Modernism and Beyond:Western Influence on Bangladeshi Poetry* তে।

অভিসন্দর্ভের শিরোনামেই উল্লেখ করেছেন 'বাংলাদেশী কবিতা'র কথা কিন্তু বাংলাদেশের বা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম ১৯৭১ সালে হলেও খোন্দকার আশরাফ হোসেন শুরু করেছেন ১৯৪৭ সাল থেকে যখন ভারতবর্ষের সাথে সাথে বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। ভূমিকায় তিনি চলে গেছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন সুরিয়ালিজম ও ডাডাবাদ ইউরোপের চিত্রশিল্পকে ছাপিয়ে এবং ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে বাংলা ভাষার কবিদেরও উদ্বেলিত করে তুলেছিল। সুরিয়ালিজম ও ডাডাবাদের ফেনিল তরঙ্গে যে দুজন কবি অবগাহন করেন, তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাস ও বিষ্ণু দে। তাঁদের কবিতা স্বপ্নের আবেগে সিদ্ধ, আর স্বপ্ন তো সুরিয়ালিজমের অন্যতম প্রধান উপসঙ্গ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী দু'টি দশকে সুরিয়ালিজমের উদ্রেক ঘটে আঁদ্রে ব্র্যাতোর *মেনিফেস্টোর* মাধ্যমে ১৯২৪ সালে। ব্র্যাতো তাঁর দ্বিতীয় *মেনিফেস্টোতে* উল্লেখ করেন, মনকে যুক্তিতর্ক মুক্ত হতে হবে। এমন ভাবনা অবশ্য ব্র্যাতোর মধ্যে এসেছিল ফ্রয়েডের 'মন:সমীক্ষণ' থেকে যা পড়ে ব্র্যাতো চর্চা করতে শুরু করে দেন কিভাবে হিপনোসিসের প্রভাব-বলয়ের মধ্য থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে লেখনী চালানো যায়। যেহেতু সুরিয়ালিস্টরা জীবনের ঘটনা প্রবাহকে স্বপ্ন ও মায়া বা Hallucination দ্বারা ব্যাখ্যা করেন এবং অচেতন মন:স্তরের উপর জোর দেন, তাই সুরিয়ালিজমের প্রায় পুরোটা জুড়েই আছে স্বপ্নালুতা। এখানে রোমান্টিসিজমের সাথে সুরিয়ালিজমের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ফ্রয়েড তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু হলো মানব মনের অচেতন স্তরে চাপা পড়ে থাকা মূলত:যৌন আকাঙ্খার ক্ষনিক মুক্তি। স্বপ্ন-বস্তু যেহেতু Displacement ও Compression এর মাধ্যমে আকৃতি ধারন করে, তাই স্বপ্ন-দ্রষ্ট বস্তু বা প্রাণী প্রায়ই বিকৃতরূপে দেখা যায়। সেকারণে স্বপ্ন একই সাথে ভীতিকর ও লোভনীয়।

সুরিয়ালিজমের দ্বারা প্রাথমিক ভাবে ফরাসী চিত্রকরগণ প্রভাবান্বিত হলেও পরবর্তীতে তা সাহিত্যে জেঁকে বসে। বাংলা সাহিত্যের জীবনানন্দ দাস আর বিষ্ণু দে এই আন্দোলনে শরীক হন। স্বপ্নালুতা তাঁদের কাব্যের ভাব ও আঙ্গিকে ব্যাপক ডিস্ট্রাকশন ঘটিয়ে দেয়, যা প্রচলিত ধারার কবিতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুরিয়ালিষ্টরা লেখেন ঘোরের মধ্যে বা হিপনোটিজমের মধ্য থেকে আর ঘোর বা

হিপনোটিজম একটা যাদুর জগৎ তৈরি করে যা নিহিত থাকে মানবমনের অচেতন বা Unconscious এর অভ্যন্তরে।

বাংলা কাব্য সার্থকভাবে ররীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে আসে ১৯৩০ এর দশকে, আর এই কাজে স্বার্থক হোন তখনকার সময়ের একগুচ্ছ তরুণ কবি। জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তবে ১৯৩০ এর দশকের আধুনিকতার জাগরনের বীজ কিন্তু রোপিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই যখন বাঙালীর মনস্তত্ত্বে ধাক্কা দেয় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ'। মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত ভদ্রলোক, যাদের বসবাস কলকাতায় হলেও জীবন-জীবীকার অনেকটাই পূর্ব বাঙলার অর্থনীতি বা কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এঁদের সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিও আকৃষ্ট করে। কার্ল মার্কস ও লেনিনের বস্তুবাদী দর্শনের সাথে এঁদের পরিচয় ঘটে এবং এটি তাদেরকে রোমান্টিসিজমের আফিমের নেশা কাটিয়ে উঠে বাস্তববাদী ও বাস্তবচিন্তা সমৃদ্ধ করে। ফ্রয়েডের মনসমীক্ষণ প্রেমের গন্ধমের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলে। প্রেম যৌন আকাঙ্খা তুষ্ট করার একটি ছল বা কলা হিসেবে পরিগণিত হয়। বদলেয়ার, মালার্মে, রিলকি ও ইলিয়ট মধ্যবিত্ত কাব্যচর্চাকারী ও কাব্য ভাবুকদের মনস্তত্ত্বজুড়ে বসেন। আবেগের স্থান দখল করে যুক্তি। কাব্যের নন্দনতত্ত্বের জায়গায় ইলিয়টের শক্ত অনুপ্রবেশ ঘটে। ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু কল্লোল (সাহিত্য পত্রিকা) এ কবিতা ছেপে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হোন যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবধারার বাইরে এসেও কাব্য রচনা করা সম্ভব। এছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কাব্যের ইউটোপীয়ার বা কল্পরাজ্যের যবনিকাপাত ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে জোরালো ভাবেই। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, যা শুরু হলো ১৯২১ সালে, তাও কিন্তু বাংলা কাব্যকে ভাববাদী দর্শনের আড়মোড়া ভেঙ্গে বস্তুবাদী জগতে প্রবেশ করতে তাড়া দেয়। এছাড়া স্যার জেম্‌স ফ্রেজারের *The Golden Bough* ১২ খন্ডে প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৯০ সাল থেকে। এটির প্রভাবও পড়তে থাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দশক গুলোতে। এই সব চিন্তাচেতনার ইন্টারসেকশন বা

ক্রসকারেন্টস সে সময়কার তরুণ কবিদের বেশ প্রভাবান্বিত করেছিল যার স্বাক্ষর বহন করে তৎকালীন কতিপয় সাহিত্য পত্রিকা যেমন- কল্লোল (১৯২৩), কালি কলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১) ইত্যাদি।

টি. এস. এলিয়টের Tradition and Individual Talent আধুনিক ভাবধারার কবিদের মনজগতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন আনে। যেখানে রোমান্টিসিজম ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাকে উৎসাহিত করে সেখানে এলিয়ট তো বলেই বসলেন যে, ব্যক্তিত্বের ক্রমান্বয় বিনাসই কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপসঙ্গ এবং এটিই কবির অভিপ্রেত হওয়া উচিত। জন কীটসের 'Negative capability' যাকে সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন 'নৈরাত্ম সিদ্ধি' বলে, তাকেই আধুনিক কবিদের কাছে মনে হয়েছে প্রধান অভীষ্ট। এটি আধুনিক কবিদের কাছে 'নৈর্ব্যক্তিকতা' নামে শিরোধার্য আদর্শে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নিখাদ নৈব্যক্তিকতা আধুনিকতার নির্ভেজাল ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। যেমন, এজরা পাউন্ড ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্যতম ধারক-বাহক হওয়া স্বত্ত্বেও ইমেজের মজবুত স্পষ্টতার উপর যেমন জোর দিয়েছেন তেমনি কবির স্বকীয়তা বা প্রতিস্বকীয়তার উপরও যথেষ্ট জোরারোপ করেছেন। আবার আধুনিক সুরিয়ালিস্টরা আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতা ও যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এনাটমী করতে গিয়ে রোমান্টিসিজমের মাদকতার আশ্রয় নিয়েছেন। আত্মবিলাপের পথে হাঁটতে হাঁটতে আত্মভাবের ফাঁদেই পড়ে গেছেন আধুনিক কবি ও সুরিয়ালিস্টরা। খোন্দকার আশরাফ হোসেন রোমান্টিসিজম থেকে আধুনিকতার বিবর্তন দেখাতে গিয়ে যে সত্যটি উদঘাটন করেছেন তা হলো, আধুনিক কবিতার উত্তরাধিকার প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক উত্তরাধিকার।

এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। তৎকালীন পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্রগুলো পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের চেতনা ও ভাবনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। স্থানীয় রাজনৈতিক আন্দোলন যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জোরালো থেকে জোরালোতর হতে থাকে, ইন্ডিয়ান কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের তৎপরতায় তা-ও তৎকালীন কবিদের ভাবনায় আন্তর্জাতিকতার মাত্রা এনে দেয়। আইরিশ বিপ্লব ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে

বেশ খানিকটা গতি আনে। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ড ভারতীয়দের ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে আরও ক্ষেপিয়ে তোলে। এমন সময়ে বাংলা কাব্যের চরিত্রগুলোর মধ্যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম নজরুল ও মোহিত লাল মজুমদারে এসে বাস্তব ও বাস্তববাদী অবয়ব পেয়ে যায়। নজরুলের কাব্য-চরিত্র যেমন আনোয়ার বা কামাল যেন ভারতবর্ষের বিপ্লব ও বিদ্রোহের স্পৃহা ধারন করে হয়ে ওঠে ভারতীয়। নজরুলের বিদ্রোহী যেন হুইটম্যানের সর্বজনীনতাকে ছাপিয়ে বিশ্বজনীনতাকে আলিঙ্গন করে।

বিশেষকরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা কাব্যে আধুনিকতার জোয়ার আসে টি.এস. এলিয়টের প্রভাবের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহীরূহ। তাঁর 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে আধুনিকতাকে এক রকম আক্রমনই করেছেন। টি.এস.এলিয়টের প্রভাবকে তেমন পাত্তাও দেননি। কিন্তু এলিয়ট ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরাণী এলিয়টের প্রুফ্রকেরই প্রতিরূপ। সে তার অচেতনমনের গহীনে কামপ্রেষ বা লিবিডোকে প্রত্যক্ষভাবে চেপে যাওয়ার প্রানন্তকর প্রচেষ্টায় বাস্তব জগতের নানান উপসঙ্গের দ্বারা জর্জরিত। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে যেসব কল্পচিত্র তৈরী করেছেন তারও গভীর সম্পর্ক এলিয়টের 'লাভ সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রকের' মধ্যেই নিহিত।

আসলে এলিয়ট তাঁর 'Tradition and Individual Talent'এ কাব্যের বা শিল্পের যে ডিপারসনালাইজেশনের কথা বলেছেন তা শিল্প-সাহিত্য বা কাব্যকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ। কাব্য যদি কল্পনার বা ব্যক্তিক ভাবনার জগৎ ছেড়ে রিয়ালিজম বা বাস্তবতার বেড়াজালে আটকে পড়ে তখন কাব্য হয়ত কাব্য থাকে না। কিন্তু এলিয়ট তাঁর 'লাভ সং' ও 'ওয়েস্টল্যান্ড' কাব্যের ক্যানভাসে মানব মনের unconscious বা অচেতন স্তরের যে গূঢ় শক্তি ও সামর্থ্যের বিশ্লেষণ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ও পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মন:স্তাত্ত্বিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে তা কাব্য তো বটেই, হয়ত কাব্যতীর্ণও।

এছাড়াও জীবনানন্দ দাস বাংলা কাব্যে আধুনিকতার যে ব্যাপক প্রসার ঘটান তার পশ্চাতে বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করেছেন বদলেয়ার, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস, টি.এস.এলিয়ট, এডগার এলান পো প্রমুখ। জীবনানন্দ দাস তাঁর 'ধুসর পান্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যে অনেক কথাচিত্র বা ইমেজারি ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে পুর্বোল্লিখিত কবিদের কাব্যের উপকরণের সাথে। বুদ্ধদেব বসু যদিও তাঁর কাব্য চর্চার শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করেছেন পরবর্তীতে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার অন্যতম প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এজরা পাউন্ডের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি রবীন্দ্র বলয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কাব্যকে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের প্রভাব মুক্ত করেন।

জীবনানন্দের মত সফলভাবেই বেরিয়ে এসেছেন রবীন্দ্র বলয় থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ফরাসী প্রতিকবাদী কবি মালার্মে, প্রখ্যাত কবি বদলেয়ার ও ভেলেরির প্রভাব তাঁর উপর বেশ সুস্পষ্ট। ভেলেরির মত সুধীন্দ্রনাথ দত্তও নারসিসিষ্টিক। এটি পরিলক্ষিত হয় তার আত্ম-অনুসন্ধিৎসু মনোভাব থেকে যা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে একাও করে দিয়েছে। বদলেয়ারের মত জীবনকে দেখেছেন নাস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। পৃথিবীটা তাঁর কাছে মনে হয়ে 'মৃতদেহের' মত। মালার্মের প্রভাবে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে ঈঙ্গিতময় ও প্রতীকী।

বিষ্ণুদে'র কবিতায় সুরিয়ালিজমের ছাপ স্পষ্ট। গ্রীক পুরাণের দেবদেবীরা এসেছে অ্যালুশন বা পরোক্ষ উল্লেখ হিসেবে। কথাচিত্র বা ইমেজেরিতে আছে এজরা পাউন্ডের প্রভাব। স্পেনের কবি লোরকার মার্কসবাদী ধারনার প্রভাবও বিদ্যমান। এছাড়া টি.এস.এলিয়টের সর্বাগ্র উপস্থিতি বিষ্ণুদের কবিতাকে দিয়েছে আধুনিকতার অবয়ব। এই সবকিছু একীভূত করলে বিষ্ণু দে ১৯৩০ এর দশকের একজন শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বকারী আধুনিক কবি। তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'সন্দীপের চর' মার্কসবাদী ভাবনায় সিক্ত। 'ঘোর সওয়ার' কবিতা সুরিয়ালিষ্ট কল্পচিত্রে সম্পৃদ্ধ। আর 'জন্মাষ্টমী' কাব্যে এলিয়টর 'পড়ো জমি' বা 'ওয়েস্ট ল্যান্ডের' প্রভাব দৃশ্যমান। সবকিছু মিলিয়ে বিষ্ণু দে এক অনন্যসাধারণ আধুনিক কবি।

অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন আধুনিক কবিদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশী পশ্চিমা কাব্য ও নন্দনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে। তাঁর মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে ররীন্দ্রনাথ থেকে হপকিন্‌স পর্যন্ত। তিনি যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের অপটিমিজম বা আশাবাদ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত, তেমনি এলিয়টের আধুনিকতাও তাঁর কবিতার সুবিস্তীর্ণ ভূমিকে উর্বর করে তুলেছে। ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক ধর্মীয় আবহ, কিন্তু তা আধুনিকতার আবেশকে গ্রাস করতে পারেনি।

চল্লিশের দশকে এসে বাংলা কবিতার অখন্ড সত্ত্বায় ভৌগলিক বিভাজনের ছেদ পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ এ ভারত ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সীমানা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে যা তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের চিন্তা চেতনার প্রবাহমান রেখায় আনে বৈচিত্র্যতা। আবার ত্রিশ এর দশকের শেষার্ধ্বে স্পেনের গৃহযুদ্ধ মার্কসবাদী কবিদের চিন্তা-চেতনায় উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজিত হয় ধর্মের ভিত্তিতে। পাকিস্তানী ইসলামিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে কিছু কবি কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। এঁদের কেউ ইসলামী ভাবধারাকে কাব্যচর্চার মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন, আবার কেউ কেউ অসাম্প্রদায়িক ভাবনা-চিন্তাকে কাব্যের প্রাণশক্তি রূপে চালিয়ে যেতে সক্ষম হোন। ফররুখ আহমেদ মধ্যযুগের ইসলামের বিস্তারের প্রশংসা ও এর হৃত ঐতিহ্য নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকেন। কিন্তু আহসান হাবিব, আবুল হোসেন প্রমুখ দেশ বিভাগের পরও কোলকাতার বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, এমনকি এলিয়ট ও ইয়েট্‌স এর প্রভাব বহন করে যেতে সফলভাবে সক্ষম হোন। তবে, কিছু কবি ভারত-পাকিস্তান দু'টির কোনটিই সফলভাবে ধারন করতে সক্ষম হননি। তাঁরা একধরনের দন্দ্বের মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন - না ভারত না পাকিস্তান। সৈয়দ আলী আহসান এঁদের অন্যতম। কাজী নজরুল ইসলাম অকপটে ধারন করেছেন উভয়কেই। যে মানসিক শক্তি নিয়ে তিনি হামদ-নাত লেখেন, সেই একই শক্তিতে রচনা করেন শ্যামাসঙ্গীত। নজরুল ধর্মীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে উঠতে পারেন তাঁর বিশ্ববীক্ষার জন্য যা তাঁর সমসাময়ীকদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭-এর দেশ ভাগ ও তৎকালীন কবিদের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে খোন্দকার আশরাফ হোসেন নিজেকে উপস্থাপন করছেন একজন ইতিহাস–সচেতন গবেষক হিসেবে। একজন ভূতত্ত্ববিদ বা আর্কিওলোজিস্ট যেমন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এর গভীরে প্রবেশ করে ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শন খুঁজে বের করে আনেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেনও কবি ও কবিতার বিশ্বাসযোগ্য অন্তর্ভেদ বা অ্যানাটমী করে ফেলেছেন। তিনি যেমন কাব্য সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন, তেমনি কবি মানস বা মনস্তত্ত্বেরও বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা করেছেন অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে। ফলে, তাঁর কবি ও কাব্য সমালোচনা তৎকালীন ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সময়ের উত্থান-পতনের চিত্রও ফুঁটে তুলেছে তার অভিসন্দর্ভের পরতে পরতে।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের সমালোচনায় খোন্দকার আশরাফ হোসেন যাঁদের উপর আলোকপাত করেছেন তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পঞ্চাশের দশক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি বৈচিত্রময় অধ্যায়। যেহেতু এসময় ভাষা আন্দোলনসহ পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো নগরকেন্দ্রিক ভাবে সংঘটিত হয়, তাই এ সময়ের বাংলা কাব্যের মনোযোগের প্রায় সবটুকুই নগর জীবনের নানান ধারা-উপধারার মধ্যে নিমগ্ন থাকে। এতে করে বাংলা কাব্যের শব্দভান্ডারে যুক্ত হয় অনেক নতুন শব্দ যা রবীন্দ্র-ঘরানার কাব্যে অনুপস্থিত। এ পর্যায়ের কাব্য অখন্ড বাংলা নয়, শুধু পূর্ব বাংলার সমাজ, রাজনৈতিক ও মন:স্তাত্ত্বিক কাঠামোর চিত্রায়নের মাধ্যমে এক স্বাতন্ত্র্য রূপ লাভ করে। তৎকালীন জীবন, জীবীকা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের নানান পর্যালোচনায় কবিরা ঝুকে পড়েন এলিয়ট, বদলেয়ার, আলবেয়ার ক্যামু, সিগমান্ড ফ্রয়েড এবং জাঁ পল সাঁর্ত্রে সহ আরও অনেক দার্শনিক ও বোদ্ধাদের প্রতি। এলিয়ট তো ধুসর শহুরে জীবনের কবি, আর শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যে এই শহরের অলি-গলির নানান সৌন্দর্য ও কদার্যতা অংকন করেছেন ইমেজেরী বা কথাচিত্রের মাধ্যমে। কবিতার ভাষাকে তিনি শহুরে মানুষের ভাষার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। আল মাহমুদ অবশ্য চেষ্টা করেছেন শহর

নির্ভর আধুনিকতা থেকে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের নির্মল আনন্দের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে। তিনি ব্যবহার করেছেন সহজ-সরল ভাষা কিন্তু এর অন্তরালে ধারন করেছেন আধুনিকতার অন্ত:স্রোত। হাসান হাফিজুর রহমান স্থানীয় ও গ্রীক পৌরানিক গল্পের ও চরিত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁর সমসাময়ীক ঘটনা প্রবাহের সাথে।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে সৈয়দ হক সুসপষ্টভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন ফ্রয়েডের দ্বারা। তাঁর কবিতার অনেকাংশ জুড়ে আছে নারী, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের টানা-পড়েন। এছাড়া নানান প্রতীক ও চিত্রকল্প বা ইমেজেরি ব্যবহার করে মানব মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরের জটিল কাঠামো আবিষ্কার করেছেন সৈয়দ হক তাঁর কবিতায়। আবার যৌনতা ও স্বপ্ন সৈয়দ হকের কবিতার অনেকটা জুড়েই অবস্থান করে। আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’ও ফ্রয়েডের প্রভাবে সম্পৃদ্ধ। তবে, খোন্দকার আশরাফ হোসেন পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যেও এলিয়ট ও ইয়েটস এর প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু খোন্দকার আশরাফ হোসেনের উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানের জায়গা হলো এই পঞ্চাশের দশকের কবিরা কিভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন তাঁদের লেখায়। এই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তিনি সকল উল্লেখযোগ্য এমনকি অখ্যাত বা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত কবিদেরও তাঁর বিশদ আলোচনায় এনেছেন। কবি শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল-মাহমুদ, শহীদ কাদরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার প্রমুখ এর সাথে আশরাফ সিদ্দিকী, আব্দুর রশীদ খান, প্রজেশ কুমার, হাবিবুর রহমান, আতাউর রহমান ও মাজহারুল ইসলামকেও তিনি তাঁর বিশ্লেষণে আনতে কার্পন্য করেননি।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন বেশ যথার্থতার সাথেই ৬০-এর দশককে দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন- প্রারম্ভিক ও পরবর্তী পর্যায়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তৎকালীন আইয়ুব খানের শাসন আমলের রাজনৈতিক অস্থিরতা। পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়ন ও অত্যাচারী নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে তার প্রভাব তৎকালীন কবিদের

মন:জগতে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে, ৬০ এর দশকের প্রথম দিককার কবিদের যেমন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ ও রফিক আজাদের কবিতায় খোন্দকার আশরাফ হোসেন এলিয়টের 'পড়ো জমি'র প্রতিফলন দেখতে পান। এই পর্বের কবিতায় উদ্যম ও উচ্ছাসের বেশ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ৬০-এর দশকের শেষ পর্যায়ের কবিতায় প্রাণ ফিরে আসে, আর এর বীজ উপ্ত ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে। তখন আইয়ুবের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনতার মধ্যে যে উচ্ছাস-উদ্দীপনা যা ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশকে স্বাধীনতার দিয়ে তাড়িত করতে থাকে, তা থেকে তৎকালীন কবি ও কবিতার কোনটিই নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। কবি শামসুর রহমান, আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ তাঁদের কবিতায় সমকালকে ধারন করেছেন ভাব, ভাবনা ও রচনা শৈলীর মধ্য দিয়ে। এছাড়া, ইউরোপীয় কবি, কবিতা ও চিত্রকর্মের প্রভাব ও এই পর্বের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অন্ধকার এর ইমেজেরী বা চিত্রকল্প সে সময়কার কবিতার অন্যতম বিষয় বা দিক ছিল। এটি শামসুর রাহমান, আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরাবাস্তব কবিতায় সুস্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট, অনিশ্চয়তা ও শ্বাসরুদ্ধকর অশ্বস্তি প্রকাশ করেছেন এঁরা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের অনুসন্ধানের আওতা যে বেশ ব্যপক তা বুঝা যায় তাঁর পান্ডিত্যে যা তিনি প্রদর্শন করেছেন পশ্চিমা কবি, কবিতা, তত্ত্ব, দর্শন ও শিল্প আন্দোলন কিভাবে ৬০ এর দশকের কবিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার বাস্তবিক ও গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণের মধ্যে। সুরিয়ালিজম কিভাবে আব্দুল মান্নান সৈয়দকে প্রভাবান্বিত করেছে তা তিনি দেখিয়েছেন সৈয়দের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। স্পেনীয় কবি লোরকা কিভাবে ৬০ এর দশকের কবিদের কাউকে কাউকে বিমোহিত করেছিল বিষাদের সুরে তার বিশ্লেষণ পাই সিকদার আমিনুল হকের কবিতার পর্যালোচনায়। এমনকি, বিটল্‌স ব্যান্ডদলের জনপ্রিয়তার ঢেউ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার হৃদয়কে যে ব্যপকভাবে আন্দোলিত করেছিল তার প্রভাবও তৎকালীন কবিতার সুর ও ছন্দে পড়েছিল। খোন্দকার আশরাফ হোসেন এটিও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এছাড়া, কবি নির্মলেন্দু

গুণ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, আহমেদ ছফা, রুবি রহমান ও হুমায়ুন কবীরের কবিমানস এর বিস্তারিত বিশ্লেষণে খোন্দকার আশরাফ হোসেন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সব দিক থেকে। এই বিশ্লেষণে সমসাময়ীক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের দিকে তিনি যে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তা সহজেই অনুমেয়।

সত্তরের দশকে এসে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম এবং ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপরিবারে হত্যাকান্ড তৎকালীন বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। কবি রফিক আজাদ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। কবি আল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে আল মাহমুদ পারলেন না ৬০ এর দশকের আল মাহমুদকে ধরে রাখতে। আশ্রয় নিলেন ধর্মাশ্রয়ী ভাবধারায়। সৈয়দ হক যদিও ৬০ এর দশকের হকের মতো জ্বলে উঠলেন না কিন্তু তাঁর কাব্য-প্রতিভার ধার ধরে রাখলেন তাঁর নাটক রচনায়। শামসুর রাহমান উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি করলেন না। নির্মলেন্দু গুণ, আবিদ আজাদ ও আবুল হাসান তাঁদের প্রেমের কবিতায় ৭০-এর দশকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফুঁটিয়ে তুললেন। এসময়ের কবিতায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ব্যাপক আকারে দৃশ্যমান। এই দশকে নতুন কয়েকজন কবিরও আবির্ভাব ঘটে। তবে, তারা ৬০-এর দশকের কবিদের প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হলেন।

৮০-এর দশকে এসে বাংলা কাব্য আধুনিকতার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর বহন করতে থাকে। কতিপয় রাজনৈতিক ঘটনা কবিতার গতি-প্রকৃতি বদলে দিতে শুরু করে। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড এবং পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড বাংলাদেশে সামরিক শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সময়কার অনেক কবি আভ্যন্তরীন পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে বৈশ্বিক বিষয়-আশ্রয়কে তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন। অস্তিত্বের সংকট, দার্শনিক সংকট, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৎকালীন কবিদের অনেকাংশে আশা ও হতাশার দোলাচলে ঠেলে দেয়। একধরনের পরিবর্তনশীলতা জেঁকে বসে কবি মানসের ক্যানভাস জুড়ে। অস্থিরতা সমাজের সর্বস্তরে সৃষ্টি করতে থাকতে অস্বস্তি। এমতাবস্থায় কবিদের ভাষার ব্যবহার, পৌরাণিক

চরিত্রের ব্যবহার, ভাষার তাত্ত্বিক প্রয়োগের মুন্সিয়ানায় সিগনিফায়ার ও সিগনিফাইডের মধ্যকার বিস্তর তফাত বাংলা কাব্যকে উত্তর–আধুনিকতার ফ্রেমে বেঁধে ফেলে। ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন কাব্যের ভাব-ভাবনাকে জটিল থেকে জটিলতর করে ফেলে। পশ্চিমাতত্ত্ব ও দর্শন বাংলা কাব্যের মধ্যে এক অস্থির আন্দোলন তৈরি করে। দেরিদা, ফুঁকো, লিওতাঁ, বদ্রিলার প্রমুখ এসময়কার কবিতায় মোটামুটি ভাবে একটি শক্ত আসন দখল করে। কাব্যপাঠও এখন আর সহজ রইল না। কাব্যপাঠ যেন তত্ত্ব পাঠ হয়ে দাঁড়ালো। কবিতার নন্দন ও নান্দনিকতার স্থান দখল করল নিরস তত্ত্বকথা। কাব্যপাঠের রস আস্বাদন এখন আর সর্বজনীন থাকল না। এটি হয়ে গেল বিদগ্ধ পাঠকের মনোযোগী পাঠ ও পান্ডিত্য পূর্ণ এপ্রোচের বিষয়। কবিতা তার ভাব ও ভাবনা ছেড়ে আশ্রয় নিলো ভাষায় ও কথায়।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন উত্তর আধুনিক ও উত্তর-উত্তর আধুনিক কবিতার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে ওপার বাংলার কবি, কবিতা ও তাত্ত্বিকদের উপর যে আলোকপাত করেছেন তা নিঃসন্দেহে ব্যাপক ও পর্যাপ্ত। এছাড়া বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের কবিতা যে এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্য দিয়ে পথ চলছে তাও তিনি নির্ণয় করেছেন যথেষ্ট দৃষ্টান্ত, যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব ও তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে খোন্দকার আশরাফ হোসেন সত্যিই একজন সত্যানুসন্ধানী গবেষক, কবি ও কাব্য সমালোচক। কবি হিসেবে খোন্দকার আশরাফ হোসেন যেমন সফল, গবেষক হিসেবেও তিনি তেমনি সফল। তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বাংলা বাক্যের বিশ শতকের অলি-গলিতে উঁকি দিয়েছে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সফলভাবে। একজন আর্কিওলজিস্টের মত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মানসের ভূমি খুঁড়ে খুড়ে বের করে এনেছেন কাব্য–ভাবনার নানান উপকরণ, নানান রেলিক। তারপর বিশ্লেষণ করেছেন ব্যাপকভাবে, দক্ষতার সাথে। বিশ্লেষণী উপস্থাপনা তাঁর অভিসন্ধর্ভকে দিয়েছে মজবুত ও নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তি। এছাড়া তাঁর অভিসন্দর্ভের নানান স্থানে বাংলা কাব্যের যেসব ইংরেজী অনুবাদ তিনি নিজে করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা তাঁকে একজন অত্যন্ত সফল ও শক্তিশালী অনুবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ঠ। তবে, খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর

অভিসন্দর্ভ লিখতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা ও ধরন মানেন নি। যেমন- ইনডেন্টেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। যেখানে এম.এল.এ. ফরম্যাট ৪ লাইনের বেশী উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডেন্টেশনের নিয়ম অনুসরন করতে বলে, খোন্দকার আশরাফ কিছু কিছু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তা করেননি। কিন্তু তাঁর বিশাল ও বিস্তারিত Bibliography দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর অনুসন্ধান, পঠন ও পর্যালোচনা কত গভীর, ব্যাপক ও সমৃদ্ধ ছিল। সর্বোপরি, তাঁর রচনা শৈলী, শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস, তত্ত্ব ও তথ্য বিচার তাঁর অভিসন্দর্ভ *Modernism and Beyond : Western Influences on Bangladeshi Poetry* কে সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্য সমালোচক ও ইতিহাস-সচেতন পাঠকের কাছে একটি মূল্যবান, প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য গ্রন্থে পরিণত করেছে।